wbeÜ

হেরি নটী বিনোদিনী ছবি

বুলবুল চৌধুরী

জীবধাত্রী বসুন্ধরায় একমাত্র মানুষকেই ঈশ্বর দান করেছেন পাপ-পুণ্যির বিস্তীর্ণ সোপান। তবে ভাগ্যে কার কী কর্মফল- সেও অদৃশ্যেরই ধারণ-বাহন। বোধের এমন শোধন যেন আমি ভাস্বর পাই বিনোদিনী দাসীর আত্মজীবনী পাঠে। এতে চয়নের শুরুতেই ভূমিকায় তার ঈশ্বর জিজ্ঞাসা বিশেষ সূচিত দেখি। তিনি লেখেন, 'আমি সংসার মাঝে পতিতা বারনারী। আত্মীয়-বন্ধুহীনা কলঙ্কিনী কিন্তু যে দয়াময় ঈশ্বর ক্ষুদ্র মহৎ সব হৃদয়েই সুখ-দুঃখ অনুভব করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন তিনিই আবার ভাগ্যহীনা কলঙ্কিনীর হৃদয়ে যন্ত্রণা-জ্বালায় সান্ত্বনার আকাঙ্ক্ষা দিয়াছেন'।

শ্রীমতি বিনোদিনী দাসী

বিনোদিনী দাসীর জন্ম ১৮৬৩ সালে এক ব্রাত্য বারবণিতা পরিবারে। জন্মসূত্রে লব্ধ জীবনচর্যার ঘাত-প্রতিঘাতে জগতের বিচিত্র স্বরূপ তিনি অবধারণ করেছিলেন। আর অভিনয় শিল্পে শরৎচন্দ্র ঘোষের দীক্ষা পেয়েই পাদপ্রদীপের আলোয় প্রথম পদবিক্ষেপ তার। পরবর্তী সময়ে এ মহৎহৃদয় পুরুষ ভবিষ্যৎ মঙ্গল ভেবে প্রিয় ছাত্রীটিকে গিরিশচন্দ্র ঘোষের অনুকূলে প্রদান করেছিলেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন আদি যুগের পেশাদারি বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের অসামান্য পরিচালক, অভিনেতা ও নাট্যকার। তারই অধীনে বিনোদিনী অর্জন যৌবন থেকে জীবনের সারভাগ অবধি বিস্তৃত হয়েছিল। এই ছাত্রীর সৃজনশীল চিত্তবৃত্তি খেয়াল করে শিক্ষাগুরু উদ্বেলিত সুরে বলেছিলেন, 'বিনোদ! তুমি আমার নিজের হাতে গড়া সজীব প্রতিমা।'

তার এই উচ্চারণ আত্মকৃতই হয়ে থাকবে। ফের 'বঙ্গ-রঙ্গালয়ে শ্রীমতি বিনোদিনী দাসী' শিরোনামের রচনায় তিনি লেখেন, 'আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, রঙ্গালয়ে বিনোদিনীর উৎকর্ষ আমার শিক্ষা অপেক্ষা তাহার নিজগুণে অধিক।'

সময়ে গুরু-শিষ্যার কথোপকথন কোন পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল সেসব সাক্ষ্য বিনোদিনী দাসীর আত্মজীবনীর নানা পর্বেই পরিস্ফুট আছে। সময়ে তা থেকে দু' একটি উদ্ধৃত করার ইচ্ছা রাখি। প্রকৃতপক্ষে গিরিশচন্দ্র ঘোষের গভীর সন্নিধানে পৌঁছে বিনোদিনী দাসী অভিনেত্রীর অভিনয় প্রতিভায় নাট্যসম্রাজ্ঞী পদগৌরবে ভূষিত হয়েছিলেন। তাকে ঘিরে বঙ্গ-রঙ্গালয় যেমন দীপ্যমান ছিল, বাংলা সাহিত্যে তার লেখনীশক্তিও তেমন স্বকীয় দীপ্তি ধরে।

মানতেই হয়, সমকালীন নাট্যশিক্ষক অর্ধেন্দু শেখর মুস্তফী ও বিহারী লাল চট্টোপাধ্যায়ের পরিচর্যায় বিনোদিনী দাসী অভিনয়ের কতেক সংগুপ্ত অংক আয়ত্ত করেছিলেন। ব্রাত্য বারবণিতা পরিবারের এক সাধারণ নটীর সর্বশ্রেষ্ঠা নায়িকায় রূপারিত হওয়ার পেছনে তাদের অবদান শিরোধার্য। তবে 'নাট্য সম্রাজ্ঞী'ই বিনোদিনী দাসীর একমাত্র পরিচয় নয়- তিনি নটী, তিনি আত্মচরিত রচয়িতা, সর্বোপরি তিনি কবি।

বিনোদিনী দাসীর লেখালেখি ঠিক মাপন দিয়ে নয়, উন্নতমানের সাহিত্যিক প্রতিভায় তা কালের এক টিপই আসলে। এরই মাঝে লুকায়িত আছে আদি যুগের সাধারণ বঙ্গ-রঙ্গালয় এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটে অত্যাশ্চর্য জটিল চালচিত্র। মূলত সাহিত্য চর্চায় তাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তিনি বলেছিলেন, 'তোমার জীবনের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ কর এবং সেই সকল ঘটনা আন্দোলন করিয়া যদি ভবিষ্যৎ জীবনের পথ মার্জিত করিতে পার, তাহা তোমার পক্ষে অতিশয় ফলপ্রদ হইবে।'

নাট্যগুরুর সংস্পর্শে বিনোদিনী দাসীর প্রতিভা অভিনয় এবং সাহিত্যে দুকূলপ্লাবী স্রোতধারাই হয়ে উঠেছিল। প্রথমে কয়েকজন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্বের উপযুক্ত শিক্ষা তার বিকাশ শুরু হলেও অল্প বয়সের প্রগলভতায় তিনি ভালো-মন্দের ছেদন টানতে অসমর্থ ছিলেন। অবশ্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের সাহচর্যে অভিনয় শিল্পে তার বহুতর তন্ময় সৃষ্ট হয়েছিল। লেখনীর গভীর মাত্রা তিনি স্পর্শ করতে গেছেন ওই গুরুদীক্ষা পেয়েই।

তবে বাইরে বাইরে খ্যাতির অমন শীর্ষচ্ছেদ ঘটালেও অতলে তিনি ছিলেন ব্যথিত কন্যা। হীন-ঘৃণিত জীবনের তাড়া আমৃত্য তার চেতনায় প্রবহমান। পাশাপাশি শিল্পের তপস্যায় তিনি উত্তুঙ্গ অধিষ্ঠানই কিন্তু ধারণ করে আছেন। অস্তিত্বের এমন মিশ্রণে পৌঁছে বিনোদিনী দাসী সময়ে সময়ে বিস্তর শূন্যতাও পুহিয়েছেন সমাজের নানা নখরাঘাতে। শিষ্যার মানসিক বিপর্যয়ের দিনগুলোতে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছাত্রীকে থিতু হতে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, 'ঈশ্বর বিনা কারণে জীবের সৃষ্টি করেন না। সকলেই ঈশ্বরের কার্য্য করিতে সংসারে আসে। সকলেই তাহার কার্য্য করে, আবার শেষ হইলেই দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।'

গুরুর সংশ্রয়ে বিনোদিনী দাসীর চেতনায় নানা পাড়িই সঞ্চারিত আসলে। সেই জন্যই বুঝি গিরিশচন্দ্র ঘোষের ঈশ্বর বিষয়ক উক্তি স্মরণে রেখে আত্মজীবনের শুরুতে তার তীব্র জিজ্ঞাসা উচ্চারিত

হয়েছে। গ্রন্থটির ভূমিকায় যেমন, মূল লেখনীর প্রারম্ভে তেমনি বুঝি সৃষ্টিকর্তার অনুসন্ধান করতে গিয়ে গুরুর উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছেন, 'মহাশয়... আমি তো আমার জীবন দিয়া বুঝিতে পারিলাম না যে, আমার ন্যায় হীনব্যক্তি দ্বারা ঈশ্বরের কি কার্য্য হইয়াছে, আমি তাহার কি কার্য্য করিয়াছি এবং কি কার্য্যইবা করিতেছি; আর যদি ইহাই হয়, তবে এতদিন কার্য্য করিয়াও কি কার্যের অবসান হইল না? আজীবন যাহা করিলাম, ইহাই কি ঈশ্বরের কার্য? এরূপ হীন কার্য কি ঈশ্বরের?'

তবে জীবধাত্রী বসুন্ধরার একমাত্র অদৃশ্য কর্তার ভাবনা নয়, মঞ্চে তিনি অভিনেত্রীরও বড় অভিনেত্রী হয়ে উঠেছিলেন। সেই সঙ্গে তার সাহিত্যে মাটি এবং মানুষের গভীর নৈকট্যই ঘটেছে। সঙ্গত কারণেই লেখিকার ভাষায় আবেগপ্রবণতা লক্ষণীয়। হলেও, এরই ভেতর দিয়ে তার সংঘাতময় জীবনচরিত উপস্থাপনায় অভিনবত্ব পেয়েছে। বাকচাতুর্য্যের দিক থেকেও তিনি স্থাপন করেছেন অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য।

বয়সের বিশেষ ধাপে উঠে নীতিগর্ভ বাক্যে আনত হলেও সময়ে সময়ে 'নাট্যসম্রাজ্ঞী'র অশান্ত চিত্তই নজরে আসে। সত্যি, সমকালীন নাট্যমোদীদের কাছে তিনি ছিলেন প্রধান আদরণীয় নায়িকা। অভিনয়ে পারঙ্গমতার জন্য তাকে 'সাইনোরা' এবং 'ফ্লাওয়ার অব দ্য ন্যাটিভ স্টেজ' উপাধিও দেওয়া হয়েছিল। স্বীয় প্রতিভার আলোকে খ্যাতি আর আদর-আপ্যায়নে কতবার করেই না তিনি অবলম্বিত হয়েছেন গণলোচনে।

অবশ্য সবের মাঝে তার উজ্জ্বল রূপ পেয়েছিল 'চৈতন্যলীলা'য় বিনোদিনী দাসীর স্বাপ্নিক পদচারণার বিষয়টি। 'অন্তঃকৃষ্ণ-বহিঃরাধা'র আবহে পুরুষ প্রকৃতির ভাব তার মধ্যে অপরিসীম ধারায়ই সৃষ্ট হয়েছিল। অন্যদিকে চরিত্র বদলে তিনি যখন 'কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কই...' জপতেন তখন দর্শক বিরহকাতর রমণীকে তাতে মূর্ত হতে দেখেছে। শুধু তাই নয়, ওই ভাবুক পরিস্ফুটনে বশীভূত তাদের অনেকে ছুটেও গেছে নায়িকার পদধূলি নিতে।

জানা যায়, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব 'চৈতন্যলীলা'র অমন বিন্যাসের সংবাদ পেয়ে রঙ্গালয়ে যেচে পদধূলি দিয়েছিলেন। আর মঞ্চে বিনোদিনী দাসীর আদ্যোপান্ত ভাবুক চিত্তের প্রসার্যমাণে খুবই অভিভূত হয়েছিলেন তিনি। ফলাফলে এই পতিতপাবন আপন করকমলের স্পর্শ দিয়েছিলেন নায়িকাকে। এবং তার শ্রীমুখে নীচুকুলোদ্ভাবা নারীকে বর দানের রীতিতে আত্মমগ্ন স্বরে বলে উঠেছিলেন, 'তোর চৈতন্য হোক।'

বিনোদিনী দাসীর অভিনয় প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র ঘোষও ছিলেন প্রবল সরব। ছাত্রীর বিষয়ে তিনি মন্তব্য করেন, 'বিনোদিনীর গঠন সকল ভূমিকা গ্রহণের উপযুক্ত- যুবক, যুবতী, বালক, বালিকা, রাজরানী হইতে ফতী পর্যন্ত সকল ভূমিকার উপযুক্ত।'

কার্যক্ষেত্রে সেই প্রমাণ বারেবারেই প্রতিষ্ঠা করেছেন এই অভিনেত্রী। 'মেঘনাদ বধে'র সাতটি ভূমিকায় বিনোদিনী দাসীকে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। কারো একার পক্ষে বৈষম্যপূর্ণ সাতটি চরিত্রের অবয়ব ধারণ সহজ সাধন নয়। অথচ প্রতিটি স্তরে তার নাট্যশক্তির চরমোৎকর্ষই সাধিত হয়েছে। প্রাণপণ অধ্যবসায়ে চরিত্র রূপায়নের ক্ষেত্রে তন্ময় হতে শিখেছিলেন এই নায়িকা। আর অভিনয়ে তেমন মাত্রা পাওয়ায় মঞ্চের ওই নারীকে দর্শকের কাছে সত্য চরিত্র বলেই অনুমিতি করা যেত।

বারো বছরের অভিনয় জীবনে স্বীয়গুণে বঙ্গবাসীর প্রীতি ও শুভেচ্ছায় আকণ্ঠ স্নাত হয়েছিলেন তিনি। তারপর মঞ্চ ত্যাগ করলেন এই 'নাট্যসম্রাজ্ঞী'। অবশ্য আত্মজীবনী পাঠে অনুভব করা যায়, তার অন্তরে এক বিষম নীল বিষ সঞ্জাত ছিল। ফলে শিল্পে একাগ্রচিত্ত হয়েও সময়ে সময়ে মোহ-ঘোরে নিপতিত হয়েছেন তিনি। অবশেষে বুঝি যাতনা কাটাতে এই নারী আপন স্বভাবের সরল স্বীকারোক্তি দিয়েছেন লেখনীর কতেক পরতে।

বিনোদিনী দাসীর জীবন রহস্যের আলো-আঁধারীতেই সবিশেষ ব্যাপৃত। বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে অতুগ্র বিচরণ সত্ত্বেও তিনি অভিনয়ের বারো বছরের মাথায় হয়ে উঠলেন নিভৃতচারিণী। তবে সবের শুভ-অশুভ বিবেচনায় আমাদের মুখ ফেরাতে হবে তার জীবনের বেড়ে ওঠা আখ্যানভাগ সমগ্রে। নাটক কিংবা যাত্রাপালার চাইতেও অধিক মেঘাড়ম্বরময় কিন্তু আবার ভারি সত্যসন্ধও সেই কাহিনী।

বাল্য-জীবনের পাতা উল্টে বর্ণিত পাই যে, কলকাতার কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের কয়েকটি খোলার ঘিচি ঘিচি ঘরের এক বাড়িতে তার জন্ম। ভাইবোন, মা ও দিদিমা এই চারে মিলে ছিল সংসার। বংশের নিয়ম অনুযায়ী বিনোদিনী দাসীর পাঁচ বছরের ভাইটির বিয়ে দেওয়া হয় আড়াই বছর বয়স্কা এক বালিকার সঙ্গে। তিনি নিজেও ছিলেন ওরকম বাল্যবিবাহের শিকার। পরে রোগ-ভোগে ভাইটির মৃত্যু ঘটলে বালিকা ভ্রাতৃবধূকে অন্যত্র পাত্রস্থ করা হয়েছিল। আর বাল্যেই বিনোদিনী দাসীও স্বামীর কাছ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন মাস্-শাশুড়ির ষড়যন্ত্রে।

অন্যদিকে পরিবারটির জীবনোপায়ের গুপ্ত চিত্রের অধিকাংশই প্রতিভাত দেখি বিনোদিনী দাসীর জবানীতে। মূলত খোলার কয়েকটি ঘরের ভাড়া দিয়েই চলছিল তাদের টানাটানির সংসার। এই সময়ে আট বছরের বালিকার বোধ কেমন জাগরুক হতে পারে তা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন বাল্যজীবনের কাঠামোতে। তা থেকে নিম্নে খানিকটা উদ্ধৃত হলো :

'... আমি একটু চালাক-চতুর ছিলাম বলিয়া আমাকে সকলে আদর করিতেন। তখন বালিকাসুলভ চপলতাবশত তাহাদের আদর আমার ভালো লাগিত। কি করিতাম, কি করিতেছি, ভাল কি মন্দ কিছুই বুঝিতে পারতাম না। কিন্তু খুব বেশি মিশিতাম না, কেমন একটা লজ্জা বা ভয় হইত। দূরে দূরে থাকিতাম, কেননা আমি বাল্যকাল হইতে আমাদের বাটীর ভাড়াটিয়াদের রকম-সকমের প্রতি কেমন একটা বিতৃষ্ণা ছিলাম; যাহারা আমাদের খোলার ঘরে ভাড়াটিয়া ছিল, তাহারা যদিও বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষ নহে, তবুও স্ত্রী-পুরুষের ন্যায় ঘরসংসার করিত, দিন আনিত, দিন খাইত এবং সময়ে সময়ে এমন মারামারি করিত যে, দেখিলে বোধ হইত বুঝি আর তাহাদের কখনো বাক্যালাপ হইবে না। কিন্তু দেখিতাম যে, পরক্ষণেই পুনরায় উঠিয়া আহারাদি হাস্য পরিহাস করিত।'

এই সময়ে গঙ্গামণি বাঈজী নামে এক গায়িকা আসেন বাড়ির ভাড়াটে হয়ে। বয়সের বিবেচনায় অতি কনিষ্ঠা সত্ত্বেও বিনোদিনী দাসীর সঙ্গে তার 'গোলাপ সই' পাতা হয়েছিল। ওই মহিলার তত্ত্বাবধানেই বালিকার গানে প্রথম তালিম নেওয়া। কালে গঙ্গামণি বাঈজী গানের পাশাপাশি বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তারই ছোঁয়ায় এবং কিছুটা যেনবা দারিদ্র্য ঘোচাতে বিনোদিনী দাসী অভিনয়কে পেশা হিসেবে নিতে মঞ্চে প্রবেশ করেন বালিকা বয়সেই।

নাটকের মধ্য দিয়েই তিনি অবরোধবাসিনীর গণ্ডিবদ্ধ জীবন পেরিয়ে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তার সুপ্ত প্রতিভা গুরু সাহচর্যে বিকশিত হয়ে চলছিল অভিনয়ে গভীর থেকে গভীরতর ধ্যান সৃষ্টি করতে পারার ভেতর দিয়ে। বিলাস-বিভূষিত লোকসমাজের মাঝে বিনোদিনী দাসীর এই নাট্যচর্চা সময়ে পরিপূর্ণ বিকশিত হয়েছিল। আবার জীবনের ঘনঘটাময় বাঁকও তাতে পরিলক্ষিত বুঝি ওইসব বিচিত্র বন্ধনীতে। অস্তিত্বের অমনতর চারণে পৌঁছে মানবী বিনোদিনী দাসী লেখেন, 'যে বাসনা সৎপথে ছুটিতে চাহিত, তখনি মোহজালে জড়িত মন তাহাকে চোরাবালির মোহে ডুবাইয়া দিয়াছে।'

বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে কলকাতায় তখন 'ন্যাশনাল থিয়েটার' এবং 'বেঙ্গল থিয়েটার' নামে দুটি পেশাদারি প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ আছে। 'বেঙ্গল থিয়েটারে' গিরিশচন্দ্র ঘোষের ছত্রছায়েই বিনোদিনী দাসীর দিন অতিবাহিত হচ্ছিল। পরে গুরুর হাত ধরে প্রতাপচাঁদ জহুরীর মালিকানাধীন 'ন্যাশনাল থিয়েটারে' প্রবেশ। এই সময়ে জনৈক বিত্তশালী এক সজ্জন জমিদার যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হন নায়িকা। তাদের সম্পর্কে লুকোচুরি, ভাঁড়াভাঁড়ির মিশেল নামতেও দেরি হয়নি। শেষাবধি গিরিশ চন্দ্র ঘোষের অনুমতিতে দুয়ের মাঝে একটি অলিখিত বসবাস গড়ে ওঠে। চূড়ান্ত পরিণতিতে কিন্তু এই সম্পর্ক বিনোদিনী দাসীর চৈতন্যে মারাত্মক ঝঞ্ঝা তুলেছিল। কেননা, সেই প্রেমিকাপ্রবর ধনবান স্বভাবের চঞ্চলতায় ক'দিন বাদেই অন্য মেয়েকে বিয়ে করে সংসার পাতেন। প্রেমিকার প্রতিও তার আচার-আচরণ প্রকাশ পায় রক্ষিতাসম। আর আপন মানসিক রূপান্তরের ওই চিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি লেখেন, 'আমাদের ন্যায় পতিতা বারনারীদের টাল- বেটাল তো সর্বদাই সহিতে হয়। তবুও তাহাদের সীমা আছে, কিন্তু আমার ভাগ্য চিরদিনই বিরূপ

ছিল। একে আমি জ্ঞানহীনা অধম স্ত্রীলোক, তাহাতে সুপথ-কুপথ অপরিচিতা। আমাদের গন্তব্যপথ সততই দোষণীয়, আমরা ভালো দিয়া যাইতে চাহিলে মন্দ আসিয়া পড়ে, ইহা যেন আমাদের জীবনের সহিত গাঁথা। লোকে বলেন, আত্মরক্ষা সতত উচিত, কিন্তু আমাদের আত্মরক্ষাও নিন্দনীয়।'

বোধের ওই সব আঁকি-বুঁকিতে উঠে তিনি স্থির প্রতিজ্ঞ হন যে, আর দেহ বিক্রি করে পাপ সঞ্চয় নয়, তা নিজেকে শুধু উৎপীড়িতই করে। বরঞ্চ অভিনয়ের ভেতর দিয়ে চলবে সৎ উপার্জন। অবশ্য এ সময়ে ভাগ্যের কারণে প্রতাপচাঁদ জহুরীর সঙ্গে তার পাওনা সংক্রান্ত বিরোধ তুঙ্গে ওঠে। সংকটের মুহূর্তে গিরিশ চন্দ্র ঘোষ শিষ্যাকে থিয়েটার আঁকড়ে থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং আশা জাগিয়েছিলেন এই বলে যে, অচিরেই একটা নতুন থিয়েটার করতে নতুন পয়সাওয়ালা লোক পাওয়া যাবে। নায়িকা শ্রেষ্ঠার পরিচয় ধরলেও বিনোদিনী দাসী মূলে মূলে ছিলেন নারী। অথচ বারবণিতার সামাজিক স্বীকৃতি নেই বিধায় বৈধ সংসার তিনি পাননি। এদিকে ধনী জমিদার যুবকের প্রেমে বিভোর নায়িকা প্রতারিত হলেও মাঝে সেই পুরুষের ঔরসে তার গর্ভে আসে এক কন্যাসন্তান।

আগেই উল্লেখ করেছি, গিরিশ চন্দ্র ঘোষ তার শিষ্যাকে এক নতুন থিয়েটার স্থাপনের আভাস দিয়েছিলেন। সে ক্ষেত্রে অচিরেই পর্দার অন্তরাল ভেদ করে উদয় হন গোর্মুখ রায়। তবে তার শর্ত ছিল এই যে, বিনোদিনী দাসীকে নিজের কাছে পাওয়ার বিনিময়েই গোড়াপত্তন হবে সেই থিয়েটারের। এবং তারই নামে হবে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ।

সন্দেহ কী, প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমিকার বন্ধন হঠাৎ ছিন্ন হওয়ার ঘটনা বিনোদিনী দাসীর মানস প্রবাহে দুঃখ এবং অপমান গভীর আঁক কষেছিল। 'ন্যাশনাল থিয়েটার' এবং 'বেঙ্গল থিয়েটারে'র হতদ্দশায় অন্যরাও হতাশায় ভুগছিলেন। নিজেদের ভবিষ্যৎ ভেবে বিনোদিনী দাসীকে তার পরোক্ষে বারবার অনুরোধ জানান গোর্মুখ রায়ের বলি হতে। এবং পেছন থেকে তাকে সবিশেষ প্রভাবিত করেছিলেন গিরিশ চন্দ্র ঘোষ স্বয়ং।

অবশেষে গোর্মুখ রায়কে তিনি গ্রহণ করেন। এ ক্ষেত্রে আত্মপক্ষ সমর্থনের ধারায় তার স্বীকারোক্তি হলো, 'থিয়েটার করিব সঙ্কল্প করিলাম। কেন করিব না? যাহাদের সঙ্গে চিরদিন ভাই-ভগ্নীর ন্যায় একত্রে কাটাইয়াছি, যাহাদের আমি চিরবশীভূত তাহারাও সত্য কথাই বলিতেছে। আমার দ্বারা থিয়েটার স্থাপিত হইলে চিরকাল একত্রে ভ্রাতা-ভগ্নীর ন্যায় কাটিবে। সঙ্কল্প দৃঢ় হইল, গোর্মুখ রায়কে অবলম্বন করিয়া থিয়েটার করিলাম।'

অন্যের সেই আশ্রয় গ্রহণের খবর পৌঁছে প্রাক্তন প্রেমিকের কানে। নতুন পুরুষকে আশ্রয় করে বিনোদিনী দাসীর থিয়েটারে বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়ান তিনি। প্রেমিকাকে ফিরিয়ে নেওয়ার জেদও রাখেন বারেবারে। কিন্তু নায়িকার প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয়। অবশ্য এতে ঘটনার সহজ ইতি টানা যায়নি। কেননা, সেই নিষেধের ফলাফলে এক সকালে প্রেমিকপ্রবর প্রতিশোধ পরায়ণের বেশে তলোয়ার হাতে এসেছিলেন প্রেমিকাকে খুন করতে। অবশ্য ভাগ্যে তিনি সে যাত্রায় বেঁচে যান।

গোর্মুখ রায়ের বাঁধনও তার জীবনে স্থায়ী হয়নি। এই যুবক বিনোদিনী দাসীর প্রতি বড়ই আকৃষ্ট ছিলেন। কিন্তু পরিবারের কঠিন চাপে শুধু নায়িকাকে পরিত্যাগ নয়, পেশাদারি থিয়েটার থেকেও বিদায় নিয়ে অদৃশ্য হন পর্দার অন্তরালে।

রঙ্গমঞ্চ থেকে 'নাট্যসম্রাজ্ঞী'র অবসর গ্রহণও ওই সময়েই। নিজেকে অমন গুটিয়ে নেওয়ার পেছনে বিনোদিনী দাসীর প্রথম প্রেমিককে দায়ী করা যায়। সংসারী হওয়ার পরও এই জমিদারপুত্র প্রেমিকাকে পেতে বারেবারে পিছু তাড়া দিয়েছেন। জানা যায়, শেষে অবস্থা এমন হয় যে, নায়িকাকে ছিনিয়ে নিতে তিনি লাঠিয়াল বাহিনী নিয়েও হানা দিয়েছিলেন রঙ্গালয়ে। বিপদ আঁচ করে দ্বিতীয় প্রেমিক গোর্মুখ রায় বিপরীতে জড়ো করেছিলেন গুন্ডাবাহিনী। শেষে জীবনের ওই পরাজয়ের মুখে পৌঁছে প্রথম প্রেমিক বলেছিলেন, 'বিনোদ, তুমি আমায় প্রতারণা করিয়া তোমার স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইলে; কিন্তু এ তোমার ভুল। তুমি কতদিন লুকাইয়া থাকিবে? আমি যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, ততদিন তোমায় শত্রুতা করিব। আমার কখনই ব্যতিক্রম হইবে না। তুমি ঠিক জানিও, আমার কথা মিথ্যা হইবে না। মৃত্যুর পরও আমি তোমায় দেখা দিব জানিও।'

আবার বিনোদিনী দাসীর স্বীকারোক্তিতে পাই, মৃত্যুর পরেও জমিদারপুত্র অতিপ্রাকৃত গল্পের ধারায় নাকি হঠাৎ হঠাৎ প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী প্রেমিকাকে দর্শন দিয়েছেন। ভাবনা দিয়ে রহস্যের ওই তল পেতে গেলে নানা শাখা-প্রশাখাই বিস্তারিত হবে। অবশ্য এই 'নাট্য সম্রাজ্ঞী'র বহুতর সত্যাসত্য জানতে তার লেখনী পাঠই হচ্ছে উত্তম অবলম্বন।

আত্মজীবনী রচনার ক্ষেত্রে নাটকের প্রসঙ্গ যেমন, ব্যক্তিগত কথন, সময় এবং সমাজবিষয়ক উক্তিও তেমন প্রকাশ করেছেন তিনি। পুরুষ শাসিত সমাজ নিয়ে তার লেখনী এ রকম : 'ভাবিতে হয়, এ জীবন প্রথম ঘৃণিত করিলে কে? হইতে পারে কেহ কেহ স্বেচ্ছায় অন্ধকারে ডুবিয়া নরকের পথ পরিষ্কার করে? কিন্তু আবার অনেকেই পুরুষের ছলনায় ভুলিয়া তাহাদের বিশ্বাস করিয়া কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়া অনন্ত নরক যাতনা সহ্য করে। সে সকল পুরুষ কাহারা? যাহারা সমাজে পূজিত-আদৃত তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নন কি? যাহারা লোকালয়ে ঘৃণা দেখাইয়া লোকচক্ষুর অগোচরে পরম প্রণয়ীর ন্যায় আত্মত্যাগের চরম সীমায় আপনাকে লইয়া গিয়া ছলনা করিয়া সরলমতি অবলা রমণীর সর্বনাশ সাধন করিয়া থাকেন।'

অসামান্য এক সুন্দরী কন্যার জননী হয়েছিলেন তিনি। তবে নীচু কুলোদ্ভবা হওয়ায় মেয়েটিকে কোনো স্কুল শিক্ষাদানে স্বীকৃত হয়নি। ওই নিষ্ঠুরতার চাইতে বড় আঘাত আসে তেরো বছর বয়সের সময় সন্তানের মৃত্যু হলে। পরে মায়ের আকুতি ফুটে ওঠে এভাবে : 'এই দুঃখময় জীবনে একটি সুখের অবলম্বন পাইয়াছিলাম। একটি নির্ম্মল স্বর্গচ্যুত কুসুমকলিকা শাপভ্রষ্টা হইয়া এ কলঙ্কিত জীবনকে শান্তি দান করিতেছিল। কিন্তু এই দুঃখিনীর কমফলে তাহাও সহিল না। আমায় শান্তির চরম সীমায় উপস্থিত করিবার জন্য সেই অণাঘ্রাত স্বর্গীয় পারিজাতটী আমায় চিরদুঃখিনী করিয়া এই নৈরাশ্যময় জীবনকে জ্বালার জ্বলন্ত পাবকে ফেলিয়া স্বর্গের জিনিস স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে।'

বিনোদিনী দাসী অভিনয় শিল্পের বিস্ময়কর প্রতিভা। বিস্ময়কর তারও বেশি তার জীবনখানি। লেখনীর ভেতর দিয়ে ওই নারীকে যেমন স্পর্শের সাধ জাগে, তেমন যেন আদিযুগের রঙ্গমঞ্চ এবং সমাজ জীবনে ঐতিহাসিক চিত্র সংরক্ষিত দেখি তাতে। পাশাপাশি তিনি রচেছেন কবিতাও। তা আপন অনুভূতির লিরিক্যাল উচ্ছ্বাসেই পরিপূর্ণ।

জন্মসূত্রে লব্ধ জীবনচর্যার কারণে নায়িকা শ্রেষ্ঠা হয়েও বিনোদিনী দাসী নিগৃহীত হয়েছেন সমকালের জটাজালে। পরবর্তীকালে তার সাহিত্যিক প্রতিভাও ঢাকা পড়ে যায় দৃষ্টির অগোচরে। সেও বুঝি সত্যি ব্রাত্য বারবণিতা পরিবারে জন্ম নেওয়ার ফলাফল।

কবি আবুল হাসানের একটি কবিতার বিশেষ চরণ স্মরণে আসে। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'আমরা আজ ভুলতে ভুলতে যেন সব পাখিদের নামও ভুলে গেছি...।' কবির বোধে বোধ রেখে বলি, সত্যি, বিনোদিনী দাসীর প্রতি আমাদের সে রকম একটি অনুচিত ঔদাসীন্য আজ বহমান পাচ্ছি। যদ্দুর মনে পড়ে, বাংলাদেশে বিনোদিনী দাসীর চর্চা বলতে অতীতে অমলেন্দু বিশ্বাস যাত্রা আকারে তার কাহিনী উপস্থাপন করেছিলেন। সম্প্রতি সাইমন জকারিয়ার গবেষণা আশ্রিত নাটক 'নটী বিনোদিনী দাসী' শিমুল বিল্লাহর একক অভিনয়ে মঞ্চস্থ হয়ে চলেছে।

তবে এই 'নাট্যসম্রাজ্ঞী'র সর্বোতমুখী প্রতিভার প্রকৃত পরিচয় জানতে আজ তার সাহিত্যকর্মের নব সংস্করণ প্রয়োজন। অবশ্য সুখের সংবাদ এই যে, সময় প্রকাশনের অধিকারী ফরিদ আহমেদ 'নটী বিনোদিনী দাসীর রচনাবলি' প্রকাশের মাধ্যমে সেই দায়িত্ব বহুতর অংশে পূর্ণ করলেন।

সবশেষে নটী বিনোদিনী দাসীর জন্য আমি রাখি আমার অভিলাষিত প্রণাম।